তাং ... 6 MAY 2017 ...
পৃষ্ঠা ... 9 ... কলাম ... 2

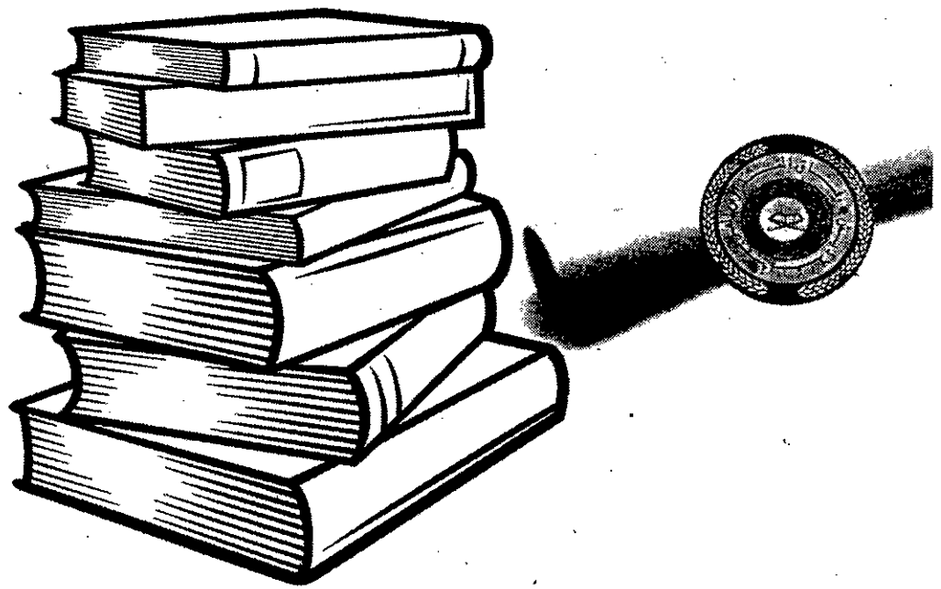

দৈনিক জনকণ্ঠ

কওমী সনদের স্বীকৃতি ইতিহাস ও রাজনীতি

অধ্যাপক ড. মীজানুর রহমান

বাংলায় পাল ও সেন বংশের শাসনের পর ত্রয়োদশ শতকের শুরুতে সুলতানী আমলের গোড়াপত্তন হয়। সুলতানী আমলের শুরুতে রাজনৈতিক অস্থিরতা মোকাবেলা তথা বিদ্রোহ দমনেই সুলতানদের বেশি সময় দিতে হয়। সুলতান ইলিয়াস শাহীর আমলে শাসন কিছুটা স্থিরতা পায়। সুলতানী আমলেও আজকের মতো শিক্ষার স্তর ছিল তিনটি। প্রাথমিক, মাধ্যমিক ও উচ্চশিক্ষা। কোন শিশুর বয়স ৪ বছর ৪ মাস ৪ দিন হলে তাকে মক্তবে নিয়ে যাওয়া হতো। বাংলাদেশের গ্রামাঞ্চলে এ প্রথা এখনও চালু আছে। মক্তবের পড়াশোনা প্রায় পুরোটাই ছিল মৌখিক, লেখার কোন ব্যাপার ছিল না। প্রথম মক্তবে যাওয়ার সময় সহপাঠী ও মাওলানা সাহেবের জন্য 'খৈ' নিয়ে যাওয়ার রেওয়াজ ছিল। 'খৈ' ভাজার মতো যেন মুখে মুখে পড়া মুখস্থ থাকে এই সংস্কার থেকেই 'খৈ' নিয়ে যাওয়া হতো মক্তবে। বাংলার সুলতানী আমলে মাধ্যমিক ও উচ্চস্তরের বিদ্যালয়গুলো 'মাদ্রাসা' নামে খ্যাত ছিল। শহরে অবস্থিত মাদ্রাসাগুলোতে আরবী ও ফার্সী ভাষা শিখানো হতো। মুঘল আমলে এসে মাদ্রাসার পাঠ্যক্রম আধুনিকায়ন করা হয়। গণিত, জ্যামিতি, হিসাব, কৃষি, ভূমি জরিপ, রাজনীতি, অর্থনীতি, ইতিহাস, প্রকৃতি বিজ্ঞান, শরীরবিদ্যা, নীতিশাস্ত্র ইত্যাদি বিষয় মাদ্রাসা শিক্ষায় যুক্ত করা হয়।

শিক্ষার মূল মাধ্যম ছিল ফার্সী। বাদশা আকবর সংস্কৃত ভাষায় লিখিত গুরুত্বপূর্ণ বইগুলো ফার্সীতে অনুবাদ করে দেন এবং হিন্দু শিক্ষার্থীদের মাদ্রাসায় ভর্তির সুযোগ করে দেন। মুঘল যুগে হিন্দুরাই মাদ্রাসায় পড়ে পড়ে ফার্সী শিখে সরকারী বড় বড় পদগুলো দখল করে নেয়, এমনকি জমিদারিও। মুর্শিদকুলি খানের সময়ে বাংলায় পনেরোজন জমিদারের মধ্যে তেরোজনই ছিল হিন্দু। মাদ্রাসা শিক্ষায় আধুনিকতায়ই হিন্দুদের আকৃষ্ট করেছিল। হিন্দুদের উচ্চশিক্ষা প্রতিষ্ঠান টোলের তুলনায় মাদ্রাসা শিক্ষা ছিল আধুনিক ও বিস্তৃত। টোল শিক্ষায় প্রায়োগিক কোন দিক ছিল না। টোলের শিক্ষা ছিল বিমূর্ত এবং ধ্যানমুখী। জীবন-মৃত্যু-পরজন্ম ইত্যাদি ভাববাদী বিষয়ে ছাত্ররা পন্ডিত হতো। পূজা-অর্চনা ছাড়া দৈনন্দিন ব্যবহারিক জীবনে তার কোন অবদান ছিল না। অন্যদিকে মাদ্রাসাগুলোতে আধ্যাত্মিক শিক্ষার পাশাপাশি আধুনিক প্রায়োগিক শিক্ষার সুযোগ সৃষ্টি হয়েছিল। তখন থেকেই মাদ্রাসায় ধর্মীয় শিক্ষার পাশাপাশি ইতিহাস, ভূগোল, গণিত, চিকিৎসাশাস্ত্র সবই পড়ানো হতো।

ইংরেজ আমলে এসে ওয়ারেন হেস্টিংসের উদ্যোগে ১৭৭০ সালে কলকাতা মাদ্রাসা প্রতিষ্ঠিত হয়। কলকাতা মাদ্রাসা স্থাপনের উদ্দেশ্য ছিল আরবী ও ফার্সী ভাষা শিখিয়ে এদেশে হিন্দু ও মুসলমানকে সরকারী কাজের উপযুক্ত করে তোলা। ১৭৭৪ সালে কলকাতা সুপ্রীমকোর্ট প্রতিষ্ঠিত হলে সেখানেও কিছু ফার্সী জানা লোকের প্রয়োজন হয়। কলকাতা মাদ্রাসা থেকেই তা আসবে এটা ছিল ব্রিটিশদের প্রত্যাশা। তবে তখনও শিক্ষায় সরকারী ব্যয় প্রায় ছিল না বললেই চলে। ১৮১৩ সালে প্রথম ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির বোর্ড সভায় শিক্ষা খাতে এক লাখ টাকা বরাদ্দ দেয়া হয়। বাংলায় এই বরাদ্দ ছিল একবারেই অপ্রতুল। ১৮৫৪ সালে প্রকাশিত 'কলকাতা রিভিউ' লিখেছে– বাংলাদেশের তিন কোটি সত্তর লাখ লোকের জন্য বরাদ্দ ছিল মাত্র আট হাজার টাকা, যা একজন কালেক্টরের বার্ষিক বেতনের এক-তৃতীয়াংশ। দরিদ্রতার কারণে গরিব জনগোষ্ঠীর জন্য তখন থেকেই বিনা পয়সায় থাকা-খাওয়ার ব্যবস্থা আছে এমন মাদ্রাসাগুলো তাদের বাধ্যতামূলক শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে পরিণত হয়। বিশেষ করে এতিমদের জন্য। আজ পর্যন্ত সরকারী কোন ব্যাপক উদ্যোগ না থাকায় এখনও এতিমদের জায়গা হয় আমাদের কওমী মাদ্রাসাগুলোতেই।

কওমী মাদ্রাসার দাওরায়ে হাদিসকে মাস্টার্সের সমমানের সনদ প্রদানের ঘোষণা নিয়ে রাজনীতি হচ্ছে। সরকারী দল আওয়ামী লীগ এবং বিরোধী রাজনৈতিক দল বিএনপি ও তার কওমীভুক্ত শরিকরা এর মধ্যে ভোটের রাজনীতি আছে বলে সমালোচনা করছে। আওয়ামী লীগের উদার অসাম্প্রদায়িক রাজনীতির পক্ষের অনেক সমমনা রাজনৈতিক দল ও নেতাকে সরকারের এ উদ্যোগের সমালোচনা করতে দেখা যাচ্ছে। আওয়ামী লীগেরও অনেকে মনে করে 'কওমী' হেফাজতিদের যত ছাড়ই সরকার দিক না কেন হেফাজতিদের ভোট কখনও নৌকায় পড়বে না। হেফাজতি অনেক নেতাই দুই দিকে যোগাযোগ রাখছে বলে পত্রিকায় খবর বেরিয়েছে। বিএনপি ও সমমনাদের সম্মতি নিয়ে এবং এদের সঙ্গে পরামর্শ করেই হেফাজতিরা গণভবনে ঢুকেছে। হেফাজত আদর্শিক কারণেই বিএনপির সঙ্গে থাকবে। হেফাজতের এক নেতা যে নামের সঙ্গে পাকিস্তানের রাজধানীর নাম যুক্ত করে নতুন নাম ধারণ করেছে (আমি নিশ্চিত এদের শিশুকালে বাবা-মা তাদের নামের সঙ্গে জালালাবাদী, ইসলামাবাদী, বাবুনগরী ইত্যাদি যুক্ত করে নাম রাখেননি)। তার সঙ্গে এক অনুষ্ঠানে দীর্ঘ আলোচনা শেষে আমারও ধারণা হয়েছে এদের সঙ্গে সম্পর্ক স্থাপন করে আওয়ামী লীগ ভোটের রাজনীতিতে তেমন কোন সুবিধা পাবে না। আমার প্রশ্ন হচ্ছে গণতান্ত্রিক ব্যবস্থায় দলীয় সরকারের অধীনে দেশ চললেও সরকার তার সকল কর্মকাণ্ড কি দলীয় ভোটারদের জন্যই করে? বিনামূল্যে বই কি কেবল নৌকা মার্কায় যারা ভোট দিয়েছে তারাই পাচ্ছে? সরকারের স্বাস্থ্যসেবা, আইটি সেবা কি যারা নৌকা মার্কায় ভোট দেয়নি তারা পাচ্ছে না? ধরে নিচ্ছি? মাদ্রাসার ছাত্র-ছাত্রী ও শিক্ষকরা নৌকায় ভোট দেয় না এবং দেবেও না। তাহলে কি তাদের জন্য সরকার কিছু করবে না।

প্রায় এগারো হাজার কওমী মাদ্রাসার প্রায় পনেরো লাখ শিক্ষার্থীর জন্য সরকার কি কিছুই করবে না? মনে রাখতে হবে কওমী মাদ্রাসায় যারা পড়ে তাদের কেউ কেউ মানসিকভাবে পাকিস্তানের আত্মীয় হলেও সবাই এদেশেরই সন্তান। সন্তান পথহারা হলে বা বিপথগামী হলে অভিভাবককেই দায়ী করা হয়। অনুরূপভাবে কওমীরা সমাজ-অর্থনীতি বিচ্ছিন্ন হলে, এমনকি সেটা তাদের নিজের ইচ্ছায় হলেও সমাজ, সরকার তাদের নিয়তির ওপর ছেড়ে দিতে পারে না।

কওমীদের নিয়ে এখন রাজনীতি শুরু হয়েছে এমনটি ভাবার কোন কারণ নেই। কওমীদের জন্ম হয়েছিল রাজনীতির মধ্য দিয়ে। ১৭৫৭ সালের সিপাহী বিদ্রোহের শতবর্ষ পালনকালে ১৮৫৭ সালে ব্রিটিশ বিরোধীরা বিভিন্ন জায়গায় বিদ্রোহ করে। ঠিক সে সময় ভারতীয় আলেম-ওলামাদের একটি অংশ ভারতীয় মুসলমানদের সংস্কৃতি ধ্বংসের ব্রিটিশ ষড়যন্ত্র প্রতিহত করার লক্ষ্যে উত্তর প্রদেশের 'দারুল উলুম দেওবন্দ লার্নিং সেন্টার' প্রতিষ্ঠা করে। পরবর্তীতে ১৮৬৬ সালে মাওলানা মোহাম্মদ কাসেম দারুল উলুম দেওবন্দ মাদ্রাসা প্রতিষ্ঠা করেন, যা বর্তমানে একটি ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়। বর্তমানে মুফতি আবুল কাসেম নোমানী এই ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়টির উপাচার্য।

> টোলের শিক্ষা ছিল বিমূর্ত এবং ধ্যানমুখী। জীবন-মৃত্যু-পরজন্ম ইত্যাদি ভাববাদী বিষয়ে ছাত্ররা পন্ডিত হতো। পূজা-অর্চনা ছাড়া দৈনন্দিন ব্যবহারিক জীবনে তার কোন অবদান ছিল না। অন্যদিকে মাদ্রাসাগুলোতে আধ্যাত্মিক শিক্ষার পাশাপাশি আধুনিক প্রায়োগিক শিক্ষার সুযোগ সৃষ্টি হয়েছিল। তখন থেকেই মাদ্রাসায় ধর্মীয় শিক্ষার পাশাপাশি ইতিহাস, ভূগোল, গণিত, চিকিৎসাশাস্ত্র সবই পড়ানো হতো

গণভবনে মাওলানা আহাম্মেদ শফির নেতৃত্বে ওলামাদের উপস্থিতিতে প্রধানমন্ত্রী কওমী মাদ্রাসার দাওরায়ে হাদিসকে কওমীদের দীর্ঘদিনের দাবি অনুযায়ী মাস্টার্সের সমমানের সনদ প্রদানের ঘোষণাকালে দারুল উলুম দেওবন্দের আদলে এই ডিগ্রী প্রদান করার কথা বলেন। তাদের নেয়া নিম্নপর্যায়ের পরীক্ষাগুলোর কোন সনদ তারা চায়নি। অনেকে প্রশ্ন করেছেন পূর্ববর্তী ডিগ্রীগুলো ছাড়া হঠাৎ করে মাস্টার্স ডিগ্রী সনদ দেয়া কতটা যৌক্তিক। এ ব্যাপারে কওমীদের বক্তব্য হচ্ছে ধর্মীয় শিক্ষাটি পরিপূর্ণ হওয়া আবশ্যক। কারণ, এই মাওলানা সাহেবরাই ধর্মীয় বিভিন্ন বিষয়ে সিদ্ধান্ত বা পরামর্শ (ফতোয়া) দেবেন। তাই কোরান-হাদিসের অর্ধসমাপ্ত শিক্ষা বা জ্ঞান দিয়ে এটা সম্ভব নয়। যেমন- একজন চিকিৎসক এমবিবিএস দুই-তিন বছর পড়ে কোন সার্টিফিকেট পান না বা চিকিৎসা করতে পারেন না। অনুরূপ দাওরায়ে হাদিস তথা মাস্টার্স ডিগ্রী ছাড়া কারও পক্ষেই কোরান-হাদিসের পরিপূর্ণ ও সঠিক ব্যাখ্যা প্রদান সম্ভব নয়, সমীচীনও নয়। তাই তারা পূর্ববর্তী ক্লাসসমূহের জন্য কোন সনদের সরকারী স্বীকৃতি চান না।

কেউ কেউ এমনও বলছেন, মাত্র ৫-১০ বছর পড়াশোনা করেই দাওরায়ে হাদিস ডিগ্রী পাওয়া যায়। এরা কিভাবে মাস্টার্সের সমতুল্য সনদ পেতে পারে। অনেকে কওমী মাদ্রাসার শিক্ষার সময় ব্যাপ্তি সম্পর্কে না জেনেই কথাগুলো বলেছেন বলে আমার মনে হয়েছে। কওমী মাদ্রাসা থেকে (৫ + ৪ + ৮) মোট সতের বছরের আগে কারও দাওরায়ে হাদিস ডিগ্রী লাভের কোন সুযোগ নেই। এটা আমি দেওবন্দের ওয়েব পেইজ দেখে নিশ্চিত হয়েছি।

এবার আসা যাক রাজনীতির কথায়। আগেই বলেছি রাজনীতির মধ্য দিয়েই কওমীদের জন্ম। দেওবন্দের প্রতিষ্ঠাতা মাওলানা আবুল কাসেমের ছাত্র মাহমুদ আল হাসান ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামের নেতা ছিলেন। ব্রিটিশবিরোধী আন্দোলন করে ১৯২০ সালে আল্ল. হাসান গ্রেফতার হন এবং মাল্টায় নির্বাসিত হয়েছিলেন। নির্বাসন থেকে ফিরে তার নেতৃত্বে জামাতুল ওলামা আল ইসলাম (বাংলাদেশে বর্তমানে হেফাজতে ইসলাম) ভারতীয় কংগ্রেসের সঙ্গে জোটবদ্ধ হয়। মাহমুদ আল হাসানের ছাত্র হাসান আহাম্মদ মাদানী ভারত বিভাগের মুসলিম লীগ প্রস্তাবে বিরোধিতা করেন। ২৯ ডিসেম্বর ১৯২৯ তার প্রতিষ্ঠিত রাজনৈতিক দল মজলিস-ই-আহরার-উল-ইসলাম ন্যাশনাল কংগ্রেসের সাথে জোটবদ্ধ হয়ে মোহাম্মদ আলী জিন্নাহর দেশ বিভাগের প্রস্তাবের বিরোধিতা করেন। হাসান আল-মাদানী ধর্মীয় স্বাধীনতা, সহনশীলতা এবং গণতান্ত্রিক সমাজ ব্যবস্থায় বিশ্বাসী ছিলেন ও তার ধর্মীয় উদারতা এতটা সম্প্রসারিত ছিল যে, এমনকি আহাম্মদিয়া সম্প্রদায়ের ওপর নিপীড়নেরও তিনি ঘোর বিরোধী ছিলেন। অখণ্ড ভারত স্বাধীনতা সংগ্রামে দেওবন্দের ভূমিকা ছিল অত্যন্ত অগ্রণী। ১৯৬৯ সালে সীমান্ত গান্ধী খান আবদুল গাফ্ফার খান ভারতে বেড়াতে এলে দেওবন্দে এসে ছাত্রদের উদ্দেশে স্মৃতিচারণ করতে গিয়ে ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামে এই মহান প্রতিষ্ঠানের ভূমিকার কথা উল্লেখ করেন। এখানে বসেই মাহমুদ হাসানকে নিয়ে ব্রিটিশবিরোধীরা অনেক পরিকল্পনা করেছেন।

দেওবন্দ থেকে কখনও প্রাতিষ্ঠানিক ফতোয়া দেয়া হতো না এবং এখনও হয় না। দেওবন্দ থেকে ফতোয়া দেয়া এবং এ নিয়ে শোরগোল একটা অতি সাম্প্রতিক বিষয়। ব্যক্তিবিশেষ প্রথম ফতোয়া দেন ২০১০ সালে যথাযথ পোশাক ছাড়া পুরুষের সঙ্গে মেয়েদের একত্রে কাজে যাওয়া ঠিক নয়- এ দিয়েই শুরু। ২০১২ সালে সালমান রুশদীর ভারত প্রবেশে নিষেধাজ্ঞা আরোপ এবং ২০১৩ এসে ফটোগ্রাফিকে আন-ইসলামিক বলে মতামত দিয়ে ব্যক্তিবিশেষ ফতোয়া দেন। মুফতিদের ফতোয়া দেয়ার বিষয়টি এখনও বিতর্কিত- ভারতবর্ষে, আমাদের দেশেও। বিষয়টি সর্বোচ্চ আন্দোলন পর্যন্ত গড়িয়েছে। যতটুকু মনে পড়ে ধর্মীয় বিষয়ে মুফতিদের ব্যাখ্যা প্রদানের নৈতিক ভিত্তি সমর্থন করলেও প্রচলিত আইনের বিরুদ্ধে কিছু বলা বা কাউকে শাস্তি দেয়ার ক্ষমতা আদালত মুফতিদের দেয়নি। কখনও এটা দেয়ার পক্ষেও আমি নই। তবে মাদ্রাসা শিক্ষাকে আধুনিকায়ন সূচনা পদক্ষেপের অংশ হিসেবে তাদের সনদের স্বীকৃতি দেয়া একটি গুরুত্বপূর্ণ কাজ। কারণ বিশাল জনগোষ্ঠীকে উৎপাদন থেকে বিচ্ছিন্ন রেখে একটি দেশ এগিয়ে যেতে পারে না।

লেখক : উপাচার্য, জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়